যুগান্তর

প্রিন্ট: ০৭ জুন ২০২৬, ০১:৩১ পিএম

শেষ পাতা

মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের প্রশ্নফাঁস

প্রিন্টিং প্রেসই আসল ঘাঁটি

মেশিনম্যানের মাধ্যমে রাতের আঁধারে প্রশ্ন পৌঁছে যেত সংঘবদ্ধ চক্রের হাতে * কোচিং সেন্টার ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করা হতো ক্রেতা * অনেকে ফাঁস হওয়া প্রশ্নে ভর্তি হয়ে নিজেরাই জড়ান চক্রে * অভিযুক্তদের ব্যাংক হিসাবে প্রশ্নফাঁসের কোটি কোটি টাকা * ১৩ বছর ধরে প্রশ্নফাঁসে জড়িত ২৯ জন

Advertisement

মহিউদ্দিন খান রিফাত

প্রকাশ: ০৭ জুন ২০২৬, ১২:০০ এএম

প্রিন্ট সংস্করণ

মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব ছিল যে প্রিন্টিং প্রেসের, সেটিই ছিল প্রশ্নফাঁসের আসল ঘাঁটি। সেখান থেকেই টানা ১৩ বছর ধরে ফাঁস হয়েছে প্রশ্নপত্র। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরোর প্রেসের এক মেশিনম্যানের মাধ্যমে রাতের আঁধারে এসব প্রশ্ন পৌঁছে যেত সংঘবদ্ধ চক্রের হাতে, যা পরে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে বিক্রি হতো ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের কাছে। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) সাম্প্রতিক চার্জশিটে উঠে এসেছে ২০০৫ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত চলা এই জালিয়াতির চাঞ্চল্যকর তথ্য।

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় ২০২০ সালের ২০ জুলাই সিআইডির উপপরিদর্শক প্রশান্ত কুমার সিকদার বাদী হয়ে মিরপুর মডেল থানায় পাবলিক পরীক্ষা অপরাধ আইনে মামলাটি করেন। দীর্ঘ তদন্ত শেষে সম্প্রতি আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। যেখানে অবৈধভাবে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া চক্রের মূল হোতাসহ ২৯ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। আর পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ না পাওয়ায় ২১ জনকে অব্যাহতির সুপারিশ করা হয়েছে।

অভিযুক্ত আসামিরা হলেন-জসিম উদ্দিন ভূঁইয়া মুন্নু, এসএম সানোয়ার হোসেন, মো. পারভেজ খান, জাকির হাসান ওরফে জাকির হোসেন দিপু, মো. সামি উল জাফর ওরফে সিটু, ডা. জেডএমএ সালেহীন শোভন, আক্তারুজ্জামান খান তুষার, মো. আব্দুস সালাম খান, শারমিন আরা জেসমিন, মো. মোহাইমেনুল ইসলাম বাঁধন, মুহাম্মদ ময়েজ উদ্দিন আহমেদ প্রধান, শাহজাদী আক্তার মীরা, মো. জহিরুল ইসলাম ভূঁইয়া মুক্তার, মো. রওশন আলী, মো. আবু রায়হান, ইমরুল কায়েস হিমেল, মো. জিল্লুর হাসান ওরফে রনি, মো. জহির উদ্দিন আহম্মেদ বাপ্পি, মো. ইউনুসুউজ্জামান খান, লুইস সৌরভ সরকার, মো. ইব্রার আলম, সাইফুল আলম বাদশা, মো. সাজ্জাদ হোসেন, মো. আলমাস হোসেন শেখ, ফয়সাল আহমেদ রাসেল, বকুল রায় শ্রাবণ, মো. রায়হানুল ইসলাম সোহান, মো. আবদুল হাফিজ হাপ্পু ও তৌফিকুল হাসান। এরমধ্যে সবাই জামিনে রয়েছে।

সিআইডির তদন্তে বেরিয়ে এসেছে, চক্রের অন্যতম মূলহোতা ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরোর প্রিন্টিং প্রেসের মেশিনম্যান মো. আব্দুস সালাম খান। তিনি মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছাপানোর কাজে যুক্ত ছিলেন। প্রশ্নপত্র কম্পোজ, প্লেট তৈরি, ছাপানো ও প্যাকেটজাত করার বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি গোপনে প্রশ্নপত্র সরিয়ে ফেলতেন। চার্জশিটে বলা হয়েছে, নিয়ম অনুযায়ী প্রশ্নপত্র ছাপার পুরো প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্টদের প্রেসের ভেতরেই থাকার কথা ছিল। কিন্তু সালাম সুযোগ বুঝে রাতে প্রেস থেকে বের হয়ে যেতেন এবং চক্রের আরেক মূল হোতা জসিম উদ্দিন ভূঁইয়া মুন্নুর হাতে পৌঁছে দিতেন। এরপর শুরু হতো প্রশ্ন বিক্রির কার্যক্রম।

তদন্তে জানা গেছে, জসিম তার ভাই জহিরুল ইসলাম মুক্তার, বোন শাহজাদী আক্তার, বোনজামাই জাকির হাসান দিপু, বন্ধু পারভেজ খান ও সহযোগী এসএম সানোয়ার হোসেনের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের কাছে প্রশ্নপত্র পৌঁছে দিতেন। এ কাজে গড়ে ওঠে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক। চক্রের সদস্য সানোয়ার হোসেনের ফার্মগেটে মোবাইল অ্যাকসেসরিজের দোকান ছিল। সেখান থেকেই মেডিকেলে ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের খোঁজ করা হতো। ২০১৩ সালে জসিম উদ্দিন তাকে পরীক্ষার্থী সংগ্রহের দায়িত্ব দেন। প্রতি শিক্ষার্থীর বিপরীতে কমিশনের আশ্বাস পেয়ে তিনি বিভিন্ন শিক্ষার্থীকে চক্রের সঙ্গে যুক্ত করেন। ২০১৫ সালে সানোয়ার ১০

জন শিক্ষার্থী সংগ্রহ করেন। পরীক্ষার আগে তাদের কাছ থেকে ৪০ থেকে ৫০ লাখ টাকার চেক, জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি ও প্রবেশপত্র সংগ্রহ করে জসিমের কাছে পৌঁছে দেন। পরে চুক্তি অনুযায়ী ফাঁসকৃত প্রশ্ন সরবরাহ করা হয়।

অভিযোগপত্রে বলা হয়, র‍্যাবের অভিযানের মুখেও থেমে থাকেনি চক্রটি। ২০১৫ সালে প্রশ্নফাঁস নিয়ে বৈঠকের সময় কয়েকজন সদস্য আটক হওয়ার পরও পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী জসিমের স্ত্রী শারমিন আরার কাছে প্রশ্ন পৌঁছে দেওয়া হয়। পরে তিনি পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রশ্ন সরবরাহের কাজ সম্পন্ন করেন। পরীক্ষার আগের রাতে জসিমের বাসায় প্রশ্ন ও উত্তর নিয়ে বিশেষ প্রস্তুতির ব্যবস্থাও করা হতো। তদন্তে দেখা গেছে, চক্রটি শুধু প্রশ্ন সংগ্রহ করেই থেমে থাকেনি। তারা কোচিং সেন্টার ঘুরে সম্ভাব্য ক্রেতা খুঁজে বের করত। পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৭ থেকে ১০ লাখ টাকার পর্যন্ত চেক নেওয়া হতো।

চাঞ্চল্যকর ঘটনা হলো, ফাঁস হওয়া প্রশ্নে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়া কয়েকজন পরবর্তীতে নিজেরাই প্রশ্নফাঁস চক্রের সদস্যে পরিণত হন। কেউ নতুন পরীক্ষার্থী সংগ্রহ করেছেন, কেউ প্রশ্ন বিতরণ করেছেন, আবার কেউ উত্তর সমাধানের দায়িত্ব নিয়েছেন। তদন্তে এমন একাধিক ব্যক্তির নাম উঠে এসেছে, যারা প্রশ্নফাঁসের সুবিধা নিয়ে চিকিৎসক হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। অর্থের বিনিময়ে অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী শিক্ষার্থীদের মেডিকেলে ভর্তির সুযোগ করে দিয়ে চক্রটি দেশের চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তদন্তে আরও জানা যায়, প্রশ্নফাঁসের মাধ্যমে চক্রটি বিপুল সম্পদ অর্জন করেছে। জসিম উদ্দিনের নামে ৩৩টি ব্যাংক হিসাব, এফডিআর ও সঞ্চয়পত্রে ২১ কোটি টাকার বেশি জমার তথ্য পাওয়া গেছে। ইউনুসুউজ্জামান খানের হিসাবে ২১ কোটির বেশি, মুহাম্মদ ময়েজ উদ্দিনের হিসাবে ১৯ কোটির বেশি, শারমিন আরার হিসাবে প্রায় ৩ কোটি এবং ডা. সালেহীন শোভনের হিসাবে দেড় কোটি টাকার বেশি জমা থাকার তথ্য মিলেছে। আরও কয়েকজন অভিযুক্তের ব্যাংক হিসাবে কোটি টাকার লেনদেনের প্রমাণ পেয়েছে তদন্ত সংস্থা।